লোকবিজ্ঞানী ড. গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

কাজল রায়

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার কথা উঠলেই প্রথমেই যে নামটি সবার আগে, তিনি হচ্ছেন গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, বিজ্ঞান একটু সহজ, সরল করে উপস্থাপনা করতে পারলে সেটা সকলের মনের মধ্যে অতি সহজেই প্রবেশ করতে পারবে তাহলে অনেকেই এই বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহবোধ করবেন।

১৮৫৯ সালের ১ আগস্ট ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার লোনসিংহ গ্রামে গোপালচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অম্বিকাচরণ, মাতা শশিমুখী দেবী। পিতা পেশায় পুরোহিত ছিলেন। গোপালচন্দ্ররা চারভাই, জ্যেষ্ঠ গোপালচন্দ্র।

গোপালচন্দ্রের পাঁচ বছর বয়সে পিতার অকাল মৃত্যু হয়। ব্যক্তিত্বময়ী মা শশিমুখীদেবী চার শিশুপুত্রকে বাঁচিয়ে রাখার ও তাদের প্রতিপালনের জন্য সচেষ্ট হলেন। গোপালচন্দ্রের যখন দশ বছর বয়স, তখন তাঁকে পইতে দিয়ে যজমানি কাজে নিয়োগ করেন।

স্বাভাবিক ভাবেই শৈশব তাঁর খুব একটা সুখের হয়নি। কোনো কিছুতেই তেমন আনন্দ পেতেন না, সব সময়ে মনের মধ্যে একটা অজানা উদয় হত। পড়াশুনায় মেধাবী ছিলেন। মেধাবী ছাত্রের পড়াশুনার আগ্রহ লক্ষ করে লোনসিংহ হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

মায়ের অদম্য ইচ্ছায় গোলাপচন্দ্র পড়াশুনা করতে লাগলেন। লোনসিংহ হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন (১৯১৩) এবং ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে আই.এ.তে ভরতি হন। কিন্তু আর্থিক কারনে পড়াশোনা শেষ করতে পারেনি গোপালচন্দ্র।

একদিকে পড়াশুনা শেষ করতে না পারার যন্ত্রণাই তাঁর জীবনে একটা বিরাট সাফল্যের ঘটনা ঘটায়, যেটা তিনি কোনোদিন ভুলতে পারবেন না। তাঁর গ্রামের স্কুলেই ভুগোলের শিক্ষক হিসাবে তিনি নিযুক্ত হন। আস্তে আস্তে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে পড়াশুনার মাধ্যমে একটা সু-সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ছাত্র-ছাত্রিদের কাছে অচিরেই তিনি অতি প্রিয় হয়ে ওঠেন। উৎসাহে স্কুলের পরীক্ষা হাতে কলমে করে দেখাতেন। কিন্তু তাঁর কৌতূহলী মন ওই বাঁধাধরা গন্ডির মধ্যে আটকে থাকতে রাজি ছিল না।

আস্তে আস্তে ভৌতিক আলো (আলেয়ার) ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠেন গোপালচন্দ্র। অবশেষে গ্রামের স্কুলের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে তিনি কলকাতায় চলে আসেন ১৯১৯ সালে।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে একটি সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি প্রথম কলকাতায় এলেন। আর গ্রামে ফেরা হল না। খুব অল্প মাইনেতে কাশীপুরে 'বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সে', টেলিফোন অপারেটার হিসেবে কাজ পাওয়া সত্ত্বেও কিন্তু মন পড়ে থাকত অন্য কোথাও, অন্য কোনেখানে।

ভাবতে লাগলেন, কেন শুঁয়োপোকা গুটি দেয়। কীভাবে একটি গুটি কেটে ডানা মেলে বের হয় অপূর্ব প্রজাপতি। লাল পিঁপড়ে আর কালো পিঁপড়ে দল বেঁধে কোথায় যায়। ওদের ভিতরে এত ব্যস্ততাই বা কীসের জন্য!

এখানে তাঁর জীবনে ঘটল 'সেলাম সংকটের' ঘটনা। তখনো অফিসের আদব কায়দা ভালো করে রপ্ত করেননি– কেবল জানতেন সেলাম নিলে দিতে হয়।

একদিন প্রেসের এক বেয়ারা এসে বলল– অ্যাগাসি সাহেব আপনাকে সেলাম দিয়েছে। হঠাৎ অ্যাগাসি সাহেব তাঁকে কেমন সেলাম জানিয়েছেন বুঝতে না পেরে তিনি বললেন অ্যাগাসি সাহেবকে আমার সেলাম জানিও। সেলাম জানানো মানে যে ডেকে পাঠানো তা তিনি জানতেন না।

মিনিট কুড়ি পঁচিশ বাদে অ্যাগাসি সাহেবে ঝড়ের বেগে আবির্ভাব, টেবিলের ওপর একটা প্রচন্ড ঘুসি মেরে বললেন– কেন আমাকে ডেকেছ? আমি তোমায় ডেকেছি আর তুমি কিনা পালটা আমাকে ডেকে পাঠালে। গোপালচন্দ্র তাঁকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করছে উনি অ্যাগাসি সাহেবকে ডেকে পাঠাননি– ততই সাহেব তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন, আর যাবার সময় শাসিয়ে যান সমস্ত ঘটনার কথা উনি উপরতলায় রিপোট করবেন। অ্যাগাসি সাহেব চলে যাওয়ার পর উনি হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। ঠিক করলেন এই ঝকমারি কাজ ছেড়ে দেবেন।

এই ঘটনার দু-তিন দিন বাদে বিখ্যাত বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস (বিখ্যাত লাঠিয়াল) বাসায় এসে উপস্থিত। বললেন– তোমাকে সার জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। স্যার 'প্রবাসী'তে তোমার লেখাটি পড়েছেন। পুলিনবাবু ছিলেন লোনসিং গ্রামের জমিদার বাড়ির লোক, এবং তাঁর আখড়া ছিল বসু - বিজ্ঞান মন্দিরের পাশে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে দেখা করলেন গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। সামান্য কিছু আলোচনার পর জগদীশচন্দ্র তাঁকে আহ্বান জানালেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণায় যোগদান করার জন্য।

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর কাছ থেকে ডাক পেয়ে স্বভাবতই তিনি আপ্লুত। মনে মনে গোপালচন্দ্র যেন এইটাই চেয়েছিলেন। গাছপালা, লতাপাতা সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণের কথাশুনে ঠিকই বলেছিলেন জগদিশচন্দ্র– 'তোমার গবেষণা বেশ জটিল' এদেশে এ নিয়ে তেমন কাজ হয়নি। একা একা তুমি কিছু করতে পারবে না, আমাদের এখানে এলে তুমি অনেক কিছু শিখতে পারবে।'

১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 'বসু-বিজ্ঞান মন্দির' -এ যোগ দেন, এবং বিশেষ মনোযোগ সহকারে কাজ শিখতে লাগলেন। তখন থেকেই গোপালচন্দ্র পেয়ে গেলেন প্রকৃতির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সম্পর্কের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক আদর্শ জায়গা। এখানেই সারাজীবন তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এখান থেকেই শুরু হয় গবেষণা, বিজ্ঞান সাধনা আর বিজ্ঞান সাহিত্য সেবা। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার ছিল তার জীবনের ব্রত।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরে তখন নানা ধরনের উদ্ভিদ নিয়েই গবেষণা হত। গবেষণার ফলাফল পত্রাকারে ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হত। এতে

ছবিও থাকত প্রচুর পরিমাণে।

আগে যিনি আঁকতেন, প্রায় বছর দুই পরে জগদীশচন্দ্র তাঁর সঙ্গে গোপালচন্দ্রকে লাগিয়ে দিলেন, ছবি আঁকার কাজে। পরে পারসপেকটিভ ড্রয়িং শিখবার জন্য গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে স্পেশাল ছাত্র হিসাবে ভরতি করিয়ে দেন। ট্রেনিং শেষে নগেন বাবুর সঙ্গে ফটোগ্রাফির কাজে গেলেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁকে একদিন বললেন, আমার এখানে অনেক রকমের ইলেকট্রিকে যন্ত্রপাতি আছে, ও-গুলো চালু রাখার জন্যে একজন ইলেকট্রিশিয়ান দরকার। তোমার যদি সময় এবং উৎসাহ থাকে তবে ট্রেনিং নেবার ব্যবস্থা করব। বলামাত্রই রাজি হয়ে গেলেন এবং ক্লাইভ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভরতি হয়ে ছয় মাসের মধ্যে শিখে ফেললেন কাজ।

এই যুবকই পরবর্তীকালে আমাদের দেশের একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন। এঁর নাম গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। অথচ প্রতিকূল অবস্থার জন্য কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করতে পারেননি।

সারা জীবন ধরে গোপালচন্দ্র বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাধারণের উপযোগী বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মাসিক পত্রিকা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' -এর সুদীর্ঘকাল সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর সঙ্গেও দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন (১৯২১-১৯৭১)।

তাঁর জন্মই হয়েছিল এক বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে, তাঁর সহজাত স্বভাব সুলভ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নিজস্ব ধারায় আপনা থেকে বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

বিজ্ঞানী বলতে এদেশে চলতি একটি ধারণা আছে। তা হল উঁচু ডিগ্রি, বিদেশি ট্রেনিং, বড়ো গবেষণার দামি যন্ত্রপাতি এসব ছাড়া যেন বিজ্ঞানী হওয়া সম্ভব নয়।

বলতে বাধা নেই যে, নিষ্ঠা, সততা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা বিজ্ঞান গবেষণার শর্ত হওয়া উচিত। আজকের দিনে এগুলির একান্তই অভাব। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন তেমনি একজন ব্যতিক্রমি। জীবনে তাঁর প্রথম স্বীকৃতি বিজ্ঞান সাহিত্য হিসাবে ১৯২১ - ১৯৭১ বসু বিজ্ঞান মন্দিরে জগদীশচন্দ্র বসুর সহকারী ছিলেন। পরে গবেষকের বৃত্তি।

ছোটোদের সম্পর্কে গোপালচন্দ্র বলেছেন, 'ছোটোদের মধ্যে কীভাবে বৈজ্ঞানিক -দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা যাবে– এ প্রশ্নটি ঠিক নয়। এক অর্থে প্রতিটি শিশুই বিজ্ঞানী। তাঁর মধ্যে রয়েছে প্রকৃত বিজ্ঞানীর মন।...প্রশ্নটা হওয়া দরকার এই যে, ছোটোদের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সমস্যাটিই কেন্দ্রবিন্দু, এর সমাধানই আজ প্রধান কাজ হওয়া উচিত।' এ বিষয়ে গোপালচন্দ্রের নির্দেশ অতীব সুস্পষ্ট। তাঁর মতে ছোটোদের মধ্যে এই কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসাকে জীইয়ে রাখতে হবে, বাড়িয়ে তুলতে হবে এবং তাদের আগ্রহ অনুসারে এই কৌতূহলকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা সমিতির সদস্য গোপালচন্দ্র ছিলেন মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ। আমার মনে হয়েছে প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্রের সাধনালব্ধ যাবতীয় অ-প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলিকে অতি যত্নসহকারে একত্রিত করে সেগুলি প্রকাশ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া উচিত। তবে সেগুলি আগামী প্রজন্মের কাছে একটি মূল্যবান তথ্য ভান্ডার হিসাবে বিবেচিত হবে এবং প্রথিতযশা বিজ্ঞানীর ব্যাপারে আর অন্ধকারে থাকতে হবে না।

এই ব্যাপারে বিজ্ঞান পরিষদ সহ কেন্দ্র ও রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের যৌথ সহযোগিতায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রে সদর্থক প্রচেষ্টা প্রয়োজন, অন্যথায় এই প্রচারবিমুখ বিজ্ঞানীর লেখা অন্ধকারেই থেকে যাবে যা কোনো দিন কেউ জানতে পারবে না।

প্রাথমিক স্তরে সরকারি এবং সরকার ঘোষিত অন্যান্য স্কুলগুলিতে আবশ্যিকভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আলোচনার ব্যবস্থা করা, তবে কিশোর বয়স থেকে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের মনে বিজ্ঞানের একটা বাতাবরণ তৈরি হবে।

সেই সঙ্গে প্রাথমিক শ্রেণির পাঠ্য পুস্তকে যদি কমপক্ষে ১০০টি শব্দের মধ্যে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের সংক্ষিপ্ত জীবন ও ভাবনা লেখা থাকে তবে বিশেষ উপকার হয়। এই ব্যাপারে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য যে সব সম্মান পেয়েছেন তা সংক্ষেপে উলেখ করা হল:

১. ১৯৪৮ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অঘোষিত সম্পাদক, ১০৫০ থেকে ঘোষিত সম্পাদক! পরে প্রধান সম্পাদক, ১৯৭৭ থেকে প্রধান উপদেষ্টা।

২. ১৯৫২-১৯৭১ ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙ-এর রূপান্তরে পেনিসিলিনের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা।

৩. ১৯৫১ প্যারিসে অনুষ্ঠিত সামাজিক পতঙ্গ বিষয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে ভারতীয় শাখা পরিচালনার জন্য আমন্ত্রণ।

৪. ১৯৬৮ 'আনন্দ পুরস্কার'।

৫. ১৯৭৪ বসু বিজ্ঞান মন্দিরে নাগরিক সংবর্ধনা।

৬. ১৯৭৪ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ফলক প্রদান।

৭. ১৯৭৫ বাংলার কীট পতঙ্গ গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার।

৮. ১৯৮০ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যকে সম্মানমূলক ডি.এস.সি. উপাধি প্রদান করেন। বিশ্ববিদ্যাহয়ের উপাধিবিহীন বিজ্ঞানীকে এরূপ সম্মান দান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে বেনজির। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনে আশ্চর্য হয়ে অনেক ছাত্র ছাত্রী প্রশ্ন করে কে এই গোপালচন্দ্র।

৯. ১৯৮১ ৮ এপ্রিল পোকামাকড় গাছ পালার পৃথিবী রেখে গোপালচন্দ্র চলে গেলেন অন্য পারে।